দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 19 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি নিয়ে দুর্নীতি চরমে

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ শিক্ষক আছে, শিক্ষার্থী নেই—গত একযুগে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন এক নৈরাজ্যকর অবস্থার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দল-দুর্নীতির পরিণতি এখন প্রত্যেক পাবলিক পরীক্ষার পরই 'শূন্য' ভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন। অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষার নীতিনির্ধারকরা প্রায়ই ঘোষণা করেন শিক্ষার্থীবিহীন প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকারের প্রচুর অপচয় হচ্ছে। এই অঙ্ক এক শ', তিন শ' এবং কোন কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বলা হচ্ছে সাত শ' কোটি টাকা। প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রীয় এই অর্থ অপচয়ের সুযোগ কে করে দিল? অপরিকল্পিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি, অনুমোদন এবং

(৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(প্রথম পাতার পর)

এমপিওভুক্ত করতে সরকারী অনুমতিই বা কিভাবে মিলেছে! রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো বিশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থায় একেকটি বিষফোড়া হিসাবে টিকে আছে।

অপ্রতুল শিক্ষার্থী এবং পাবলিক পরীক্ষায় শোচনীয় বিপর্যয়ের মুখে পড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল শুরু করেছে সরকার। বিষয়টিকে তুলনা করা হচ্ছে, গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার সঙ্গে। ইতোমধ্যে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক বেসরকারী শিক্ষকের বেতন বন্ধ হয়ে গেছে, এই নিষ্ঠুর হুমকি ঝুলছে অনেকেরই ওপর।

জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষকের তালিকা প্রণয়নও শুরু করেছে মন্ত্রণালয়। বিষয়টি শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে ভীতি এবং অস্থিরতা। দেশজুড়ে ৬০ থেকে ৭০ হাজার অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছে বলে অনুমান করছেন বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। এদের প্রায় সবাই বেতনের সরকারী অংশ পাচ্ছেন। এই তালিকা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের পরিচালক জনকণ্ঠকে বলেছেন, পরিদর্শন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। এদিকে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন রেখেছেন, জনবল কাঠামোর ভেতরে বা বাইরে যেভাবেই হোক এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে এসব শিক্ষক চাকরি করছেন। ত্রুটি যদি থেকেই থাকে তাহলে তা নিয়োগদাতা হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি বা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং এমপিওভুক্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তার।

নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে গড়তে দেশে এখন শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, রাষ্ট্রীয় অর্থের এত বড় অপচয় মেনে নেয়া যায় না। মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী দেশের ৮৮৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী নেই।

তবে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) জরিপে দেখা গেছে, সকল শর্ত বিবেচনা ও মূল্যায়ন করলে প্রায় দশ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন না কোনভাবেই অযোগ্য, অসম্পূর্ণ। নিয়ম অনুযায়ী ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২০ হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে একটি কলেজ থাকার কথা। এই নীতিমালা মানা হলেও দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ৫৮০৬ টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বেশি রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬৯১টি। এটি থেকে ফুটে ওঠে শিক্ষার দৈন্যদশা এবং করুণ চিত্র। অবশ্য একই প্রতিষ্ঠানও একাধিকবার শূন্য ভাগ পাসের রেকর্ড গড়েছে। এ ধরনের ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুমতি এবং এমপিওভুক্তি হয়েছে মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায়, বিভিন্ন সরকারের আমলে।

পাঁচ বছরে শূন্য ভাগ পাস করা স্কুল ও মাদ্রাসা

সাল	স্কুল	মাদ্রাসা
২০০০	১১২	২১৬
২০০১	২৮০	২৪০
২০০২	২৩৫	৩৫৫
২০০৩	২৪৫	৭০৬
২০০৪	২৫৫	২৫৫

রাজশাহীর বরেন্দ্র নৈশ কলেজে গিয়েছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। সরেজমিন দেখে এসেছেন দুর্দশা। লেখাপড়ার বেহাল অবস্থা, ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক বেশি, আলাদা অধ্যক্ষ এমনকি হিসাব-নিকাশের বালাই নেই। শিক্ষক নিয়োগের নামেও চলে বাণিজ্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, রাজশাহীর জেলা প্রশাসক, বোর্ড চেয়ারম্যান কলেজটি তদন্ত করেছেন। খোদ প্রতিমন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও স্রেফ রাজনৈতিক কারণে কেউই বেশিদূর এগোতে পারেননি। পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী থাকা বরেন্দ্র কলেজকে প্রভাতী শাখা এবং বরেন্দ্র নৈশ কলেজকে নৈশ শাখা হিসাবে কৌশলে দাবি করা হচ্ছে, যেটি নিয়মবহির্ভূত। অধ্যক্ষ অনিল কুমার সাহা জনকণ্ঠকে বলেছেন, নিয়মনীতি মেনেই কলেজ চলছে। তিনি দাবি করেন, নৈশ কলেজে শিক্ষক ১৮, কর্মচারী ৪ এবং শিক্ষার্থী রয়েছে ২২ জন। তবে পৃথক সূত্রে বলা হয়েছে, মাত্র পাঁচ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন দু'ডজন। রাজধানীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ষাট। ঢাকা জেলায় এই সংখ্যা দশ। কিন্তু রাজশাহী জেলায় ডিগ্রী কলেজ ৫৮টি এবং চট্টগ্রাম জেলায় এই সংখ্যা ৬৮। দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ন্যূনতম শিক্ষার্থী নেই। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমতি না নিয়ে ডিগ্রী কোর্স চালুর অভিযোগে ২৭৬ কলেজের বেতন বন্ধ করেছে। এই এসসি পরীক্ষায় ধারাবাহিক ফল খারাপ করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪০ সরকারী কলেজ কালো তালিকাভুক্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের বক্তব্য হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক থাকতে হবে, পরীক্ষার্থীও পাস করতে হবে। আর তা না হলে সরকারী, বেসরকারী যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে।

প্রতিবছরই মন্ত্রী, সাংসদ এবং প্রভাবশালীদের চাপে সরকার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করছে। একশ্রেণীর সংসদ সদস্য এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেকেই এই প্রক্রিয়ায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন। জনশ্রুতি রয়েছে, কিছু সংসদ সদস্যের মুখ্য কাজ এখন ঠিকাদারির পাশাপাশি এমপিওভুক্তি। ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বলা হচ্ছে, একজন সংসদ সদস্য পাঁচ বছর মেয়াদে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি করলেই পরবর্তী নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যায়। সন্ত্রাসী ইমেজ থাকা জনপ্রতিনিধির নামেও এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ঝুলছে। এর পাশাপাশি বিএনপি সরকারের আমলে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির হিড়িক পড়ে। উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য সরকারের সহানুভূতি লাভ বা এমপিওভুক্তি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের নেতৃত্বে সদ্য সমাপ্ত ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা শেষে তৃণমূল নেতাদের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত সাত প্রস্তাবের প্রথমটি হচ্ছে, সরকার যেন এমপিভুক্তির ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেন। সরকারী দলের তৃণমূল নেতাদের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নামে মফস্বলে হচ্ছেটা কি?

সরকারী দলের সাংসদদের মধ্যে এমপিওভুক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগলেও বিরোধী দলের বেলায় এই সুযোগ নেই বললেই চলে। খোদ প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এলাকায় অবস্থিত একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, কিছুদিন আগে নেত্রীর বাসায় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসেছিলেন। বললেন, বিদ্যালয়টির অবস্থা ভাল, কয়েকজন বৃত্তি পেয়েছে, সব শর্ত পূরণও করেছে। কিন্তু এমপিওভুক্ত হচ্ছে না। নেত্রী বিষয়টি দেখার জন্য তাঁর ওপরই দায়িত্ব দিলেন। নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, তাঁর কাছে মনে হয়েছে বিদ্যালয়টি অবশ্যই এমপিওভুক্ত হওয়ার যোগ্য। সম্ভবত নেত্রীর এলাকার প্রতিষ্ঠান বলে তা ঝুলে আছে।

এদিকে পাস-ফেল বা ছাত্র সংখ্যা বিবেচনায় এমপিওভুক্ত বাতিল, জনবলবহির্ভূত শিক্ষক ছাঁটাই প্রক্রিয়ায় দেশের সবচেয়ে বড় পেশাজীবী গোষ্ঠী বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন বেতন বন্ধের বিপক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, এসব অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও পাঠদানের অনুমতি কে দিয়েছে, এমপিওভুক্ত কে করেছে—সেটি আগে খুঁজে দেখা দরকার। তা না করে একজন দরিদ্র শিক্ষকের পেটে লাথি দেবার যুক্তি আমরা মানি না।

বাঙালী মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতিধন্য রংপুরের মিঠাপুকুর থানায় মোট ১৭ ইউনিয়নে রয়েছে ১৬ কলেজ। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে দুই বছরে গড়ে উঠেছে ১৪ টি কলেজ। এলাকার শিক্ষা সচেতনরা বলেছেন, এলাকা এবং জনসংখ্যা বিবেচনা করলে এ থানায় তিনটি প্রতিষ্ঠান তথা পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি কলেজ, শঠিবাড়ী ডিগ্রী কলেজ এবং মিঠাপুকুর ডিগ্রী কলেজই যথেষ্ট। বাকি ১৩ কলেজের মধ্যে শিক্ষার্থীর অভাব, পরীক্ষার্থীর অভাব, জরাজীর্ণ অবকাঠামোসহ বিভিন্নমুখী শিক্ষাবিমুখ পরিবেশ বিদ্যমান।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের পরিচালক অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যে বেশি হয়েছে, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। কিভাবে হয়েছে এবং কিভাবে চলছে তা প্রত্যেক সচেতন মানুষই জানেন। এক প্রশ্নের জবাবে পরিচালক বলেন, জনবল কাঠামোর বাইরে কত শিক্ষক আছেন সে তালিকা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, দেশে আর নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরকার নেই। খুব প্রয়োজন বা জরুরী হলে ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে চাহিদা নির্ধারণ করে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা উচিত।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের নেতা অধ্যক্ষ এম এ সাত্তার বলেন, মূলত রাজনৈতিক কারণে ব্যাঙের ছাতার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এমনকি এক বিষয়ে, এক পরীক্ষার্থীর জন্য আজকাল শিক্ষককে পাহারা দিতে হয় যা জাতীয় অপচয়ের অন্যতম দৃষ্টান্ত।